জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনে মিরপুরের ইউএনও’র উদ্যোগ

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলায় জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও শতভাগ নিশ্চিত করতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও)।

আজ বৃহস্পতিবার তিনি নিয়মিত ইউনিয়ন পর্যায়ের সভা, স্কুল, মসজিদ এবং সামাজিক অনুষ্ঠানগুলোতে অংশ নিয়ে জনগণকে সচেতন করছেন।

উপজেলার তালবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ এলাকায় আয়েশা ও মায়েশা এর জন্মের ০৭ দিনের মধ্যেই জন্ম নিবন্ধন সম্পন্ন করেন তাদের পিতা মাতা।

সরকারি নির্দেশনা অনুসরণ করার জন্য, আয়েশা ও মায়েশা’র মায়ের হতে তুলে দেওয়া হয় জন্ম নিবন্ধন সনদ, ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা পত্র, খেলনা সামগ্রী এবং মিষ্টির বাক্স।

তিনি বলেন, “প্রতিটি শিশু জন্মের সঙ্গে সঙ্গে যেন তার জন্মনিবন্ধন সম্পন্ন হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে। একইভাবে, মৃত্যু নিবন্ধন করাও বাধ্যতামূলক। এই দুটি নিবন্ধন না হলে ভবিষ্যতে নাগরিক সেবা গ্রহণে নানা জটিলতা তৈরি হয়।”

তিনি আরও বলেন, আমরা প্রত্যাশা করি, আয়েশা ও মায়েশা এর পিতামাতার মতো সকল পিতামাতাই শিশু জন্মের সাথে সাথেই জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সম্পন্ন করবেন। জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন অনুযায়ী, শিশু জন্মের ৪৫ দিনের মধ্যেই জন্ম নিবন্ধন সম্পন্ন করা বাধ্যতামূলক।

এছাড়া, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে জনগণের তথ্য সংরক্ষণ এবং দ্রুত নিবন্ধনের জন্য ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে বলেও জানান তিনি।

মিরপুর উপজেলার ইউএনও’র এই প্রচেষ্টা জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন শতভাগ বাস্তবায়নের দিকে এক সাহসী পদক্ষেপ। সম্প্রতি খুলনা বিভাগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইউএনওর সম্মাননা লাভ করেন তিনি।

[redacted]

[redacted]

গাংনীতে নরমাল ডেলিভারিতে জন্ম নেওয়া নবজাতক পেল উপহার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহাবাটি গ্রামের তরিকুল ইসলাম ও শারমিন আক্তার দম্পতির তৃতীয় ছেলে সন্তান জন্ম গ্রহণ করেছে নরমাল ডেলিভারিতে।

তাদেরকে শুভেচ্ছা উপহার দিতে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এসেছিলেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম।

শনিবার (০১ই নভেম্বর) বেলা সাড়ে বারোটার দিকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নরমাল ডেলিভারিতে সন্তান জন্ম নেয়া ওই দম্পতির হাতে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম নবজাতকের জন্ম নিবন্ধন কার্ড ও শুভেচ্ছা উপহার তুলে দেন। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন, গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্মকর্তা আব্দুল আজিজ সহ অনেকেই।
গতকাল শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) রাতে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে তরিকুল ইসলাম ও শারমিন আক্তার দম্পতির এই ছেলে সন্তানটি জন্ম নেয়। নবজাতকের নাম রাখা হয়েছে শামিম আহমেদ। জেলা প্রশাসকের উপহার পেয়ে নবজাতকের পিতা-মাতা আনন্দিত। তারা বলেন, ইতিপূর্বেও তাদের দুটি ছেলে সন্তান রয়েছে তারাও নরমাল ডেলিভারির মাধ্যমে জন্ম নিয়েছিল।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক শুভেচ্ছা উপহার বিতরণ শেষে বলেন, আমাদের মায়েদের যে ন্যাচারাল উপায়ে সন্তান প্রসবের অর্থাৎ নরমাল ডেলিভারি যেটিকে বলা হয় সেটিতে আমরা সকলকে উৎসাহিত করার জন্য যেখানে নরমাল ডেলিভারিতে বাচ্চা হবে সেখানে আমরা উপহার নিয়ে যাব। আমি দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে এই উদ্যোগটি নিয়েছি। উপহারের সাথে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটি থাকছে সেটি হচ্ছে ওই বাচ্চার জন্ম নিবন্ধন এর কার্ডটি তাৎক্ষণিক উপহারের সাথে তুলে দেওয়া হচ্ছে।

জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রমে বিভাগ সেরা সদর ইউএনও খায়রুল ইসলাম

জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রমে বিশেষ অবদান রাখায় ২০২৫ সালের জুন মাসে মেহেরপুর সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোঃ খায়রুল ইসলাম খুলনা বিভাগে সেরা হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন।

নড়াউল জেলার কালিয়া ইউএনও রাশেদুজ্জামান ২য় এবং মাগুরা জেলার মহাম্মদপুর ইউএনও শাহিনুর আক্তার ৩য় স্থান অর্জন করেন। খুলনা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রম মনিটরিং সেল এ স্বীকৃতি প্রদান করে। একই কার্যক্রমে গাংনী ইউএনও আনোয়ার হোসেন চতুর্থ এবং মুজিবনগরের ইউএনও পলাশ মন্ডল অষ্টম স্থান অর্জন করেন।

মেহেরপুরে যোগদানের পর থেকে মোঃ খায়রুল ইসলাম বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, মাদক নিয়ন্ত্রণ ও সরকারি খাসজমি উদ্ধারে প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখে চলেছেন। ২০২৪ সালে এসএসসি পরীক্ষার আগে শিক্ষার্থীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে উদ্বুদ্ধ করায় এলাকায় প্রশংসিত হন।

চলতি বছরের ২ জানুয়ারি মোঃ খায়রুল ইসলাম মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সদরে দায়িত্ব গ্রহণের আগে তিনি মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলার বাসিন্দা এবং ৩৫তম বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তা। ২০১৭ সালে দিনাজপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সহকারী কমিশনার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। এরপর টাঙ্গাইলে এনডিসি, সহকারী কমিশনার (ভূমি) এবং মুজিবনগরে ইউএনও হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি দুই কন্যা সন্তানের জনক। তাঁর স্ত্রী মাহামুদা পারভীন মেহেরপুর সরকারি কলেজের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন।

আরবি ভাষার উৎস, জন্ম ও ক্রমবিকাশ- এম এ এস ইমন

তাদের বাণিজ্যপথের মাধ্যমে নাবাতিয়ান আরবি ভাষা ও এই রূপান্তরিত আরামাইক লিপি আরব উপদ্বীপের পশ্চিম উপকূলে হিজাজ (বর্তমানে ইসলামের পবিত্র নগরী মক্কা ও মদিনা এই হিজাজ অঞ্চলে অবস্থিত) হয়ে ইয়েমেন পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

যা-ই হোক, প্রথমে নাবাতিয়ান বাণিজ্যের প্রভাবে এবং পরে ইসলামের প্রসারের সাথে সাথে সারা আরব উপদ্বীপেই ধীরে ধীরে আরবি ভাষা ছড়িয়ে পড়ে, এবং আগের প্রাচীন ভাষাগুলোর ব্যবহার কমতে কমতে এককালে হারিয়ে যায়। প্রধান ব্যতিক্রম থেকে যায় নাবাতিয়ান রাজ্য থেকে দূরতম প্রান্তে অবস্থিত ইয়েমেন ও ওমান সীমান্তে হাজরামাউত ও জুফার অঞ্চল, যেখানকার আঞ্চলিক ভাষা তখনও আরবি ছিল না।

৩২৯ খ্রিষ্টাব্দে দামেস্কের ১২০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে আন-নামারাতে আরেকটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়। এই শিলালিপির ভাষাটি প্রায় শাস্ত্রীয় আরবির মতোই। যদিও এই শিলালিপিগুলো স্পষ্টতই আরবি ভাষায় লেখা, এগুলো আরবি লিপিতে লেখা নয়, বরং এটি নাবাতিয়ান লিপি, যা আরামাইক লিপি থেকে এসেছে।

কিন্তু কিছু শিলালিপি খ্রিষ্টীয় ৪র্থ এবং ৫ম শতাব্দীরও রয়েছে, যেগুলো আরবি ভাষার মতো একটি লিপিতে লেখা। সাধারণত মনে করা হয় যে, আরবি লিপি নাবাতিয়ান লিপি থেকে বিকশিত হয়েছে, এবং এই শিলালিপিগুলো একটি স্ক্রিপ্ট বা লিপিতে লেখা হতে পারে যেটি এই দুটির মধ্যে হতে পারে। এই শিলালিপিগুলো মূলত উত্তর আরবের ছিল।

অন্যদিকে, দক্ষিণ আরবীয়রা তাদের বাণিজ্যিক আদান-প্রদান, ঐতিহাসিক ঘটনাবলি ও সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়কে লিপিবদ্ধ করার জন্য যে ধরনের উপাদান ব্যবহার করত, তা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেছে। এই ধরনের শিলালিপির প্রাচীনতম নিদর্শনগুলোর বয়স খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টম ও নবম শতক।

এই লিপিগুলো লেখা হতো একবার বাঁ দিক থেকে ডান দিকে, পরের লাইন

ডান থেকে বাঁ দিকে। এই লিপিগুলো থেকে জানা যায় যে, দক্ষিণ আরবীয় বা মিনীয়-সাবিয়ান ভাষার (হিময়ারাইট নামেও পরিচিত) বর্ণমালাতে ২৯টি অক্ষর ছিল যা আধুনিক আরবি বর্ণমালাতেও দেখা যায়। বর্ণগুলোর আকার ছিল অনেকটা কাঁটাওয়ালা আঁকশি বা কুড়ুলের মতো।

এগুলো এসেছিল সিনিয় বর্ণমালা থেকে, যেটি আবার ফিনিশিয় ও মিশরীয় বর্ণমালার পূর্বসূরির মধ্যে যোগসূত্র গড়ে তুলেছিল। এই সমস্ত সুসামঞ্জস্য অক্ষরগুলো একটি দীর্ঘ উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করে।

অন্যান্য সেমিটিয় বর্ণমালার মতো এর বর্ণমালাতেও কেবলমাত্র ব্যঞ্জনবর্ণেরই অস্তিত্ব ছিল। বিশেষ্য পদ গঠনে, ক্রিয়ার ধাতুরূপ, ব্যক্তিবাচক সর্বনাম ও শব্দভাণ্ডারের বেশ কিছু ক্ষেত্রে আক্কাদিয়ান (অ্যাসিরো-ব্যাবিলনিয়ান) ও ইথিওপীয় ভাষার সঙ্গে দক্ষিণ আরবীয় ভাষার মিল লক্ষ্য করা যায়।

আবার, এই ভাষার মধ্যে ভাঙা-ভাঙা বহুবচন লক্ষ্য করা যায় যা উত্তর আরবীয় ও ইথিওপীয় ভাষার বৈশিষ্ট্যকেই প্রতিফলিত করে। আক্কাদিয়ান, দক্ষিণ আরবীয় ও ইথিওপীয় ভাষা কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুরনো সেমিটিক ভাষার বৈশিষ্ট্যকেই প্রতিফলিত করেছে। ইয়েমেন সংস্কৃতি ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ আরবীয় ভাষার বিলুপ্তি ঘটে, আর এই স্থান দখল করে নেয় উত্তর আরবীয় ভাষা। উত্তর আরবে ‘উকাজ’-এর মতো সাহিত্য মেলা, কাবায় বার্ষিক হজ্বযাত্রা ও মক্কার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে।

আরবে ইসলাম আগমনের আগে, উপদ্বীপের চারপাশে আরবি ভাষার অসংখ্য উপভাষা প্রচলিত ছিল। তবে ‘কোইন’ নামে একটি সাধারণ সাহিত্যিক ভাষাও ছিল কবিতার জন্য, যা বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে ব্যবহৃত হতো। সাহিত্যিক ভাষা কোইনে লেখা কবিতার অংশগুলো ক্লাসিক্যাল বা ধ্রুপদী আরবি ভাষার প্রাচীনতম উদাহরণ।

ধ্রুপদী আরবি সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন হলো ‘মুআল্লকাত’ নামক কবিতা সংকলন। আরব পণ্ডিতদের মতে, ইসলামি যুগের আগে তদানীন্তন প্রাক-ইসলামি কবিদের লেখা সেরা সাতটি দীর্ঘ কবিতা সংগ্রহ করে একে একত্রে সংকলন করা হয়। এই প্রাক-ইসলামি কবিদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ইমরুল-কায়েস, যিনি খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের প্রথমার্ধে জীবিত ছিলেন। পরবর্তী যুগে আরবি ব্যাকরণবিদরা যে ভাষাকে ‘আরাবিয়্যা’ নাম দিয়ে প্রমিত আরবি হিসেবে গ্রহণ করেন, তার প্রথম

প্রভাবিত হয়েছিল।

এই নতুন উদীয়মান উপভাষাগুলোর প্রথম শতাব্দীকে নিও বা নব্য-আরবি হিসেবে উল্লেখ করা হয়। যদিও ধ্রুপদী আরবি প্রমিত ছিল, সবাই এটি নিখুঁতভাবে লিখতে পারত না। ক্লাসিক্যাল আরবি এবং নব্য-আরবি বা এর উপভাষা উভয়ের বৈশিষ্ট্য ধারণ করা লেখাকে মিডল বা মধ্য আরবি ভাষা বলা হয়।

‘মিডল’ কোন সময়কে বোঝায় না, বরং এই আরবি ক্লাসিক্যাল এবং নব্য-আরবির কথোপকথনের মধ্যবর্তী ভাষা ছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নিও আরবি উপভাষাটি (যেটি আধুনিক) আধুনিক আরবিসহ কথোপকথন উপভাষায় বিকশিত হতে থাকে, কিন্তু সাহিত্যিক আরবি তুলনামূলকভাবে স্থির ছিল, কারণ কুরআনের আরবিকে সর্বদাই আদর্শ হিসেবে দেখা হতো।

আদর্শ আরবি অনুসরণ করার জন্য এটি সম্ভবত উপভাষার উপর রক্ষণশীল প্রভাব ফেলেছিল, এবং এই কারণে নেপোলিয়ন মিশরে প্রবেশের পরেও তাদের মধ্যে খুব বেশি পরিবর্তন আসেনি।

মধ্যযুগের প্রথমদিকে আরবি ভাষা ছিল ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর সংস্কৃতির প্রধান বাহন। এটি বিশেষ করে বিজ্ঞান, গণিত এবং দর্শনে বহুল ব্যবহৃত হতো। ফলে ইউরোপের দেশগুলোর অনেক ভাষাও আরবি থেকে প্রচুর শব্দ ধার করেছে।

ইউরোপের খ্রিস্টান ও আরবের মুসলিম সভ্যতার নৈকট্য এবং দীর্ঘস্থায়ী মুসলিম সংস্কৃতি ও আরবি ভাষার উপস্থিতির কারণে স্প্যানিশ, পর্তুগিজ, কাতালান এবং সিসিলিয়ান শব্দভাণ্ডারে আরবি শব্দ দেখা যায়।

উদাহরণস্বরূপ, ‘আলজেবরা’ বা ‘বীজগণিত’ আরবি শব্দ ‘আল-জাবর’ থেকে এসেছে। মাল্টিজ বা মাল্টার ভাষা হলো একটি সেমিটিক ভাষা, যা আরবি ভাষার একটি উপভাষা থেকে এসেছে এবং এটি ল্যাটিন বর্ণমালায় লেখা হয়। গ্রীক এবং বুলগেরিয়ানসহ বলকান রাষ্ট্রের ভাষাগুলোও অটোমান তুর্কিদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে আরবি ভাষার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শব্দ অর্জন করেছে।

১৭৯৮ সালে আরব বিশ্ব প্রথমবারের মতো পশ্চিমা বিশ্বের সাথে যোগাযোগের বৃহত্তর যুগে প্রবেশ করে এবং নতুন পশ্চিমা ধারণাগুলো প্রবাহের জন্য আরবি ভাষাকে বিংশ শতকের গোড়ার দিকে আধুনিকায়ন করার প্রয়োজনিয়তা অনুভব করে। ফলশ্রুতিতে আরবি ভাষার

আঞ্চলিক একাডেমিগুলো ভাষার একটি সংস্কার প্রক্রিয়া শুরু করে। সংস্কার প্রক্রিয়াটি প্রধানত ভাষার শব্দভান্ডার সম্প্রসারণ এবং ভাষাকে আধুনিক করা নিয়ে ব্যাপক কাজ করে। সংস্কার প্রক্রিয়ার পর আরবি ভাষা আধুনিক স্ট্যান্ডার্ড আরবি হিসাবে পরিচিতি লাভ করে।

বিশ্বজুড়ে আরবি ভাষা অন্যান্য অনেক ভাষাকে প্রভাবিত করেছে, বিশেষ করে মুসলিম সংস্কৃতি এবং মুসলিমরা যেসব দেশ জয় করেছিল সেগুলোর ভাষাকে। সর্বাধিক প্রভাবিত ভাষার মধ্যে কয়েকটি হলো ফার্সি, তুর্কি, হিন্দি, উর্দু, কাশ্মীরি, কুর্দি, বসনিয়ান, কাজাখ, বাংলা, মালয় (ইন্দোনেশিয়ান এবং মালয়েশিয়ান), মালদ্বীপ, পশতু, পাঞ্জাবি, আলবেনিয়ান, আর্মেনিয়ান, আজারবাইজানীয়, সিসিলিয়ান, স্প্যানিশ, গ্রীক, বুলগেরিয়ান, তাগালগ, সিন্ধি, ওড়িয়া, হিব্রু, হাউসা, এবং আফ্রিকার কিছু কিছু ভাষা, যেমন: সোয়াহিলি, সোমালি। বিপরীতে, অন্যান্য ভাষা থেকেও আরবি ভাষায় শব্দ এসেছে, যার মধ্যে রয়েছে আরামাইক, হিব্রু, ল্যাটিন, গ্রীক, ফার্সি এবং কিছুটা তুর্কি (উসমানী সাম্রাজ্যের কারণে), ইংরেজি এবং ফরাসি (লেভান্টে তাদের উপনিবেশের কারণে) এবং অন্যান্য সেমিটিক ভাষা, যেমন- আবিসিনিয়ান।

আরবি বর্ণমালা লেখা হয় ডান দিক থেকে বাম দিকে। এই বর্ণমালাগুলো নাবাতিয়ানের মাধ্যমে আরামাইক থেকে উদ্ভূত হয়েছে। সাধারণ লেখার পাশাপাশি আরবি বর্ণমালার অনেকগুলো লিখনশৈলী বিকশিত হয়েছিল।

এদের মধ্যে অন্যতম ও সুন্দর একটি লিখন পদ্ধতি হলো আরবি ক্যালিগ্রাফি। পবিত্র কুরআন ও অন্যান্য বই লেখার জন্য, এবং মসজিদ, মাজার বা ইসলামের স্মৃতিসৌধের শিলালিপিগুলোর সজ্জা হিসেবে আরবি ক্যালিগ্রাফির ব্যবহার দেখা যায়। এই ক্যালিগ্রাফিগুলো কুরআনের একটি আয়াত বা একটি হাদিস বা আরবিতে লেখা যেকোনো বিমূর্ত আর্ট বা শৈল্পিক নকশা হতে পারে।

ক্যালিগ্রাফিগুলো বেশ মনোমুগ্ধকর হয় বলে বিভিন্ন ডিজাইন হিসেবে এগুলোর ব্যবহার চোখে পড়ে। সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে এসব ক্যালিগ্রাফির বিশ্বজোড়া ব্যাপক কদর রয়েছে।

সংকলনেঃ এম.এ.এস ইমন
প্রকাশক, দৈনিক ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’

আরবি ভাষার উৎস, জন্ম ও ক্রমবিকাশ- এম এ এস ইমন

আরবি নামটি শুনলে প্রথমেই আমাদের মনে আসে এটি পবিত্র কুরআনের ভাষা, যা ইসলাম ধর্মের সাথে সম্পর্কিত। সারা বিশ্বের মুসলমানরা প্রতিদিন তাদের প্রার্থনায় আরবি ভাষায় কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করে থাকেন।

এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আরবি ভাষা মুসলমানদের কাছে একটি অতি পবিত্র ভাষা হিসেবে গণ্য।সর্বশেষ নবী ও রাসুল হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মাতৃভাষা ছিল আরবি, আর আল্লাহ জিব্রাইলের (আ.) মাধ্যমে তার উপর এই ভাষায় ওহী নাযিল করতেন।

ঐতিহাসিকভাবে মুসলিমদের বিশ্বাসমতে, আরবিই সেই ভাষা যার মাধ্যমে জান্নাত বা স্বর্গে মানুষ একে অন্যের সাথে বা ফেরেশতাদের সাথে যোগাযোগ করবে।

আরবি হলো বিশ্বের বহুল ব্যবহৃত কথ্য ভাষাগুলোর মধ্যে একটি। ব্যবহারের দিক থেকে এটি পঞ্চম স্থানে, যা আজকের মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা জুড়ে একটি সরকারি ভাষা হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। এমনকি এর ব্যবহার বিভিন্ন উপভাষাতেও রয়েছে। উপরেই বলা হয়েছে, আরবি ভাষা মুসলিমদেরর কাছে একটি ধর্মীয় ভাষা হিসেবেও কাজ করে।

কারণ, আরবি হলো পবিত্র ধর্মগ্রন্থ আল-কুরআনের ভাষা, এবং এটি ইসলাম ধর্মের সাথে সরাসরি যুক্ত। এভাবে এই ভাষা ধর্মীয় তাৎপর্যের সাথে সাথে ঐশ্বরিক উদ্ঘাটনের সাথেও যুক্ত, যা ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে।

জনপ্রিয় এই আরবি ভাষা কোথা থেকে এসেছে? এর জন্ম কীভাবে হলো? আর, কীভাবেই বা এর পরিবর্তন ঘটেছে? প্রাচীন এই ভাষা সম্পর্কে জানাতেই আজকের এই লেখা। পাঠকবৃন্দ, তো চলুন আরবি ভাষা সম্পর্কে জানতে ঘুরে আসি ইতিহাসের পাতা থেকে।

আজকের বিষয় হলো আরবি ভাষা, যাকে আরবিতে ‘আল আরাবিয়া’ বলা হয়।

প্রায় ২৯৩ মিলিয়ন স্থানীয় ভাষা ব্যবহারকারী, এবং বিশ্বব্যাপী মোট ৪২২ মিলিয়ন মানুষ আরবি ভাষায় কথা বলেন। বিশ্বের ২৬টি দেশের অফিসিয়াল ভাষা আরবি। এটি জাতিসংঘের ছয়টি অফিসিয়াল ভাষার মধ্যে একটি।

কুরআনের ভাষা হিসেবে এটি সারা বিশ্বের ১.৭ বিলিয়ন মুসলমানের ধর্মীয় ভাষাও। যদিও তাদের অধিকাংশই আরবি ভাষায় মনের ভাব আদান-প্রদান পারে না, কিন্তু প্রার্থনা এবং ধর্মীয় অধ্যয়নের জন্য আরবি ভাষা সম্পর্কে কিছু জ্ঞান তাদের অধিকাংশেরই রয়েছে। এই ভাষার রয়েছে বিভিন্ন বৈচিত্র্য।

প্রধান বৈচিত্র্যগুলোর মধ্যে একটি হলো কুরআনের শাস্ত্রীয় আরবি। অনেক পণ্ডিত একে আরবি ভাষার সবচেয়ে নিখুঁত রূপ বলে মনে করেন, এবং কেউ কেউ বলেন যে, এটি একমাত্র সত্যিকারের আরবি, কারণ এটাই ছিল সেই ভাষা যে ভাষায় সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ শেষ নবী ও রাসুল হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর কাছে কুরআন অবতীর্ণ করেন। তারপর রয়েছে মডার্ন স্ট্যান্ডার্ড আরবি, যা আজ অফিসিয়াল ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত আরবি ভাষার একটি রূপ।

এটি সাহিত্যে ব্যবহৃত আরবির আধুনিক রূপ, যা কুরআনের ধ্রুপদী আরবির উপর ভিত্তি করে তৈরি। এটা ঠিক শাস্ত্রীয় আরবির মতো নয়, কিন্তু উভয়কেই আরবরা ‘আল-ফুশা’ বলে উল্লেখ করেছে, যার অর্থ ‘বাকপটু বক্তৃতা’।

সেমিটিক ভাষার উপগোষ্ঠীর সর্বোত্তম শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কে ভাষাবিদদের মধ্যে এখনও ভিন্নমত দেখা যায়। সেমিটিক ভাষাগুলো প্রোটো-সেমিটিক এবং মূল বা সেন্ট্রাল সেমিটিক ভাষার উদ্ভবের মধ্যে, বিশেষত ব্যাকরণে ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে বলে তারা মনে করেন।

ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ থেকে জানা যায়- আরবি ভাষা সেমিটিক ভাষা পরিবার থেকে এসেছে, এবং এটি ঐ পরিবারের অন্যান্য সেমিটিক ভাষার সাথে বিকশিত হয়েছে। সেই দিক থেকে বিশেষ করে আরবি ভাষা মূলত কোনো নির্দিষ্ট ভাষা কোথা থেকে এসেছে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বেশ কঠিন, কারণ ভাষা সর্বদা পরিবর্তিত এবং বিকশিত হয়।

আরবি এবং অন্যান্য সেমিটিক ভাষা, যেমন- হিব্রু, আরামাইক এবং ফিনিশিয় সব একই প্রোটো-সেমিটিক ভাষা থেকে বিকশিত হয়েছে। আরবি ভাষা মূল বা সেন্ট্রাল সেমিটিক শাখার অন্তর্গত একটি ভাষা, যেখানে

তাই যোগাযোগের জন্য ব্যবহার হতো সেই সময়ের মধ্যপ্রাচ্যের প্রধান ভাষা আরামাইক। তবে স্থানীয় অধিবাসীরা মোটামুটি নিশ্চিতভাবেই প্রাচীন আরবি ভাষায় কথা বলতেন। খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে নাবাতিয়ানদের মধ্যে প্রথম আরামাইক লিপির একটা টানা হাতের রূপভেদে আরবি ভাষা লিখতে দেখা গেল, যা আইন আভদাত (Ein Avdat) শিলালিপিতে দেখা যায়।

এটিই প্রাচীনতম শিলালিপি, যেটি নিঃসন্দেহে আরবি ভাষার, যার সময় প্রায় ১২৫ খ্রিষ্টাব্দ। পাঠক, আপনারা নিচে যে ছবিটি দেখতে পারছেন, সেটিই আইন আভদাত শিলালিপি, যা বর্তমান ইসরাইলের দক্ষিণে নেগেভ মরুভূমির একটি গিরিপথ ‘আইন আভদাত’-এ পাওয়া গেছে। এটি একটি আরামাইক শিলালিপি, তবে এতে আরবি ভাষার তিনটি লাইন রয়েছে।

সংকলনেঃ এম.এ.এস ইমন
প্রকাশক, দৈনিক ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’

গাংনীতে শিশু বিবাহ ও জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন বিষয়ক মতবিনিময় সভা

গাংনী উপজেলার রাইপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিশু বিবাহ, মানব পাচার, মাদক প্রতিরোধ ও জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন বিষয়ে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে এ সভার আয়োজন করা হয়।

জাতীয় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ফোরামের সহযোগিতায় মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এই কর্মসূচির আয়োজন করে। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. মিজানুর রহমান। এতে বক্তব্য রাখেন সহকারী শিক্ষক সাহেবুল ইসলাম, আবু সাঈদ ও মাতিউন নেছা। শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন মউকের প্রোগ্রাম ম্যানেজার মোছাঃ ফাহিমা আক্তার।

আলোচকরা শিশু বিবাহের কুফল, মানব পাচারের ভয়াবহতা ও মাদক

প্রতিরোধের গুরুত্ব তুলে ধরেন। পাশাপাশি, ৪৫ দিনের মধ্যে সকল শিশুর জন্ম ও মৃত্যুর নিবন্ধন সম্পন্ন করার বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সচেতন করা হয়।

সভায় বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকরা অংশগ্রহণ করেন।

অসংখ্য নায়িকার সঙ্গে সম্পর্ক-তিনবার বিয়ে, এখন কেমন আছেন সঞ্জয় দত্ত?

নামের পাশে যতই দীর্ঘ হোক অপরাধের ছায়া, নারীদের মধ্যে তার জনপ্রিয়তায় তার আঁচ লাগেনি। ক্যারিয়ারের প্রথম থেকেই তার ব্যক্তিগত জীবন রঙিন হয়েছে বিভিন্ন প্রেয়সীর সান্নিধ্যে।

নিজের ‘প্লে বয়’ ভাবমূর্তি নিয়ে তিনি খুশি। নিজেই এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন সুনীল-পুত্র। এমনকি, তার স্বীকারোক্তি, তিনি একইসঙ্গে তিনজন বান্ধবীর সঙ্গেও ডেটিং করেছেন!

সঞ্জয় দত্ত এবং টিনা মুনিম ছিলেন ছোটবেলার বন্ধু। পরে টিনার বিপরীতেই জীবনের প্রথম ছবি ‘রকি’-তে অভিনয় করেন সঞ্জয়। সে সময় থেকেই তাদের বন্ধুত্ব ধীরে ধীরে প্রেমে পরিণত হয়।

মা নার্গিসের গভীর প্রভাব ছিল সঞ্জয়ের জীবনে। নার্গিসের মৃত্যুর পর যে শূন্যতা তৈরি হয়েছিল, সেটা অনেকটা পূরণ করেছিলেন টিনা। পরে জানান সঞ্জয়। বান্ধবী টিনা তার জীবনে চলার পথে অনেক কিছুই নিয়ন্ত্রণ করতেন। কিন্তু কোনওদিন হস্তক্ষেপ করেননি সঞ্জয়ের ক্যারিয়ারে।

এমনকি, তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে জুটি বেঁধে সঞ্জয়ের অভিনয় করাতেও কোনও আপত্তি করতেন না টিনা। অন্যদিকে নায়িকা টিনাকে ঘিরেও একাধিক সম্পর্ক গুঞ্জরিত হয়েছিল। সেসব শুনে সঞ্জয় নাকি মেজাজ হারাতেন। টিনাকে ঘিরে এতটাই তীব্র ছিল তার অধিকারবোধ।

কিন্তু সঞ্জয়-টিনা সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। শোনা যায়, সঞ্জয়ের উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন মেনে নিতে পারেননি অভিনেত্রী। আবার ইন্ডাস্ট্রিতে কান পাতলে এও শোনা যায়, সঞ্জয়কে ছেড়ে টিনা মুনিম সে সময় রাজেশ খান্নার ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলেন।

রিচা শর্মার ছবি সঞ্জয় প্রথম দেখেছিলেন পত্রপত্রিকায়। তখন থেকেই তিনি রিচায় মুগ্ধ। পরে এক ছবির মহরতে দু’জনের আলাপ হয়। রিচার টেলিফোন নম্বর যোগাড় করে সঞ্জয়ই তার সঙ্গে প্রথম আলাপ করেন।

বেশ কয়েকবার অনুরোধের পরে রিচা রাজি হন সঞ্জয়ের সঙ্গে আলাপ করতে। ধীরে ধীরে সেখান থেকেই প্রেমের সূত্রপাত। ১৯৮৭ সালে উটিতে ‘আগ হি আগ’ ছবির শুটিংয়ে রিচাকে প্রোপোজ করেন সঞ্জয়। বিয়ের প্রস্তাবে রাজি হতে সময় চেয়েছিলেন রিচা।

কিন্তু তিনি যতক্ষণ ‘হ্যাঁ’ বলেননি, ততক্ষণ সঞ্জয় হাল ছাড়েননি। অবশেষে বিয়ের প্রস্তাবে রাজি হন রিচা। ১৯৮৭ সালেই বিয়ে করেন সঞ্জয়-রিচা। পরের বছর জন্ম হয় তাদের একমাত্র মেয়ে ত্রিশলার।

কিন্তু আচমকাই সুর কাটল তাদের দাম্পত্যে। জানা গেল রিচা আক্রান্ত ব্রেন টিউমারে। যখন ধরা পড়ে, তখন অসুখ পৌঁছেছে জটিলতার শেষ সীমায়। চিকিৎসক এবং কাছের জনদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে রিচা মারা যান ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বরে। আমেরিকায় তার চিকিৎসা চলছিল। জীবনের শেষ কয়েকটা মাস তিনি কাটিয়েছিলেন নিউইয়র্কে, তার বাবা মায়ের বাড়িতেই। মৃত্যুর আগে তার এবং সঞ্জয়ের সম্পর্ক তিক্ত হয়ে উঠেছিল।

রিচা যে সময় অসুস্থ, সেই সময় থেকে সঞ্জয়কে নিয়ে নতুন গুঞ্জন। এবার তার নামের সঙ্গে জড়িয়ে গেলেন মাধুরী দীক্ষিত। ১৯৯১ সালে ‘সাজন’ সিনেমার সময় থেকেই নাকি তারা একে অন্যের প্রতি অনুরক্ত। ১৯৯৩ সালে নিজের কাছে বেআইনি অস্ত্র রাখার অপরাধে টাডা আইনে গ্রেফতার হন সঞ্জয়। তারপরই সম্পর্ক থেকে সরে যান মাধুরী। যদিও সঞ্জয় বা মাধুরী, দু’জনের কেউ এই সম্পর্কের কথা স্বীকার করেননি।

এরপর সঞ্জয়ের জীবনে আসেন রিয়া পিল্লাই। ১৯৯৮ সালে মডেল রিয়াকে বিয়ে করেন সঞ্জয়। কিন্তু এই দাম্পত্যও ভেঙে যায় কয়েক বছর পরই। শোনা যায়, দু’জনের জীবনেই পরকীয়া তাদের বিবাহবিচ্ছেদের কারণ। ২০০৫ সালে ডিভোর্স হয়ে যায় সঞ্জয়-রিয়ার।

যার জন্য রিয়ার থেকে দূরে সরে যান সঞ্জয়, তিনি নাকি নাদিয়া

দুরানি। কোথায় তাদের আলাপ হয়েছিল, জানা যায় না। তবে শোনা যায়, ‘কাঁটে’ সিনেমার সময় আমেরিকায় শুটিং স্পটে পৌঁছে গিয়েছিলেন নাদিয়া। এরপরই রিয়া ডিভোর্সের সিদ্ধান্ত নেন।

নাদিয়ার সঙ্গে সঞ্জয়ের সম্পর্ক এরপর ভেঙে যায়। যেভাবে উল্কার মতো এসেছিলেন, সেভাবেই সঞ্জয়ের জীবন থেকে হারিয়ে যান নাদিয়া। সে সময় নাকি কিছু দিনের জন্য লিজা রে’র সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়েছিল সঞ্জয়ের। কিন্তু তাদের সেই সম্পর্ক ছিল খুবই অল্প সময়ের জন্য।

তবে লিজা এই সম্পর্কের কথা অস্বীকার করেছেন বরাবর। সঞ্জয়ের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক নাকি ছিল অভিনেত্রী রেখারও। একসঙ্গে শুটিং করতে গিয়েই দু’জনের আলাপ। গুঞ্জন, দু’জনে পালিয়ে গিয়ে বিয়েও করেছেন। কিন্তু এই গুঞ্জনের পক্ষে কোনও প্রমাণ মেলেনি। রেখার জীবনীকার ইয়াসিন উমরও এই দাবি অস্বীকার করেছেন। সঞ্জয় নিজেও রেখার সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা অস্বীকার করেছেন।

কিমি কাটকার এবং রতি অগ্নিহোত্রীর সঙ্গে সঞ্জয়ের নাম জড়িয়ে গুঞ্জন শোনা গিয়েছে। কিন্তু সেসবই খুব অল্প সময়ের জন্য। নায়িকাদের সঙ্গে সঞ্জয়ের প্রেমের গুঞ্জন বন্ধ হয় তার তৃতীয় বিয়ের পর।

মান্যতার সহজ সরল স্বভাব ভাল লেগেছিল সঞ্জয়ের। দু’বছরের প্রেমপর্বের পরে ২০০৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে মান্যতাকে বিয়ে করেন সঞ্জয়। ২০১০ সালে জন্ম হয় তাদের যমজ সন্তানের। সঞ্জয়ের অতীতের অসংখ্য সম্পর্কের কোনওটাই ছায়া ফেলেনি তার তৃতীয় দাম্পত্যে। জীবনের কঠিন সময়েও তার পাশে স্তম্ভের মতো আছেন স্ত্রী মান্যতা। সূত্র: আনন্দবাজার

সূত্র- বিডি প্রতিদিন